বাংলা নাট্যরীতি

বিষ্ণু বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূ মি কা

'বাংলা নাট্যরীতি' দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হল। প্রায় দু'দশক আগে বইটি প্রথম বেরিয়েছিল। লেখা হয়েছিল তারও বছর পাঁচেক আগে। বইটি পাওয়াও যায় না বহুদিন ধরে। তারপর 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থার শ্রীসন্দীপ নায়কের আগ্রহে বইটি আবার বেরুল। এ বিষয়ে বন্ধু অশোককুমার মিত্র যে উৎসাহ দেখিয়েছেন ও উদ্যোগ নিয়েছেন তার তুলনা মেলা কঠিন। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদের নয়।

এ বইতে সূচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটকের রচনাশৈলী কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। প্রথম প্রকাশের পর বইটি বিবিধ পত্রিকায় প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে রদ-বদল ঘটেছে সামান্যই।

এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'নাটক' নামের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' সংকলনে প্রবন্ধটি গ্রন্থিত হয়েছিল। তার লেখক হিসেবে নাম রয়েছে কালীপ্রসন্ন ঘোষের। প্রবন্ধটি 'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে প্রবন্ধকারের নাম ছিল না বলে সম্পাদকদ্বয় সম্ভবত ভেবেছিলেন এটি সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার' নামক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধটি 'নাটক —আধুনিক বাংলা নাটক' নামে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার' অক্ষয়চন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নি, প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৯৬৪/৬৫ খ্রিস্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন ড. কালিদাস নাগ ('ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা থেকে বইটি বেরিয়েছিল।)। ড. কালিদাস নাগ এ বিষয়ে ভূমিকায় কিছু উল্লেখ করেন নি যদিও 'সমালোচনা সাহিত্য' সংকলনটি বেরিয়েছিল তার অনেক আগে। কাজেই প্রবন্ধটির আসল লেখক কে তা নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে। তবে আভ্যন্তর প্রমাণে মনে হয় এটি অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখা। 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার' গ্রন্থে 'নাটকের সৃষ্টিকাল' নামে আরেকটি প্রবন্ধ রয়েছে। এটি 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯৪ সালে বেরিয়েছিল। উভয় প্রবন্ধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই 'নাটক' প্রবন্ধটির লেখক হিসেবে অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া হল।

বইটি লেখার সময় নানা উপযোগী পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্য এখন প্রয়াত। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

প্রসঙ্গত ড. নীতিশ বসুর সহযোগিতার কথাও ব্যক্ত করছি।

বিষ্ণু বসু

বিষয়-ক্রম

যুগপরিবেশ	৯
দর্শক, মঞ্চ ইত্যাদি	৩৪
ঐতিহ্য ঃ গ্রহণ ও অর্জন	৫৭
দ্বন্দ্ব চেতনা	৭৩
প্রসঙ্গ ঃ ট্র্যাজেডি মেলোড্রামা	৮৭
কমেডি থেকে প্রহসন	১০২
চরিত্র ঃ ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি	১২৯
অঙ্ক ও দৃশ্যবিষয়ক	১৪৯
সংলাপ	১৭১

প্রথম অধ্যায়

যুগ পরিবেশ

এক

বাংলা সাহিত্য, সেই সঙ্গে বাংলা নাটক, যেহেতু বাংলার নবজাগৃতির অন্যতম ফসল, সেহেতু বাংলা নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাংলার নবজাগৃতিকে আমরা সাধারণত ইউরোপিয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালোবাসি। এবং নবজাগৃতির ফলে ইউরোপে চতুর্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে যে অভূতপূর্ব জীবন উল্লাসের সমারোহ দেখি, তার হুবহু প্রতিফলন বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুসন্ধান করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমাদের বিশ্লেষণগুলি হয় বাহ্যিক, ইউরোপিয় রেনেসাঁস ইউরোপে যে সমাজবিন্যাসের কাঠামোটিকে পরিবর্তিত করেছিল, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে সরিয়ে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়কে প্রকাশ করেছিল—এই সহজ সত্যটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সামন্ততন্ত্রের নিষ্পেষণকে অস্বীকার করে, প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বুর্জোয়া জীবনাদর্শ তখনকার ইউরোপিয় সমাজে এনেছিল মুক্তির আস্বাদ। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগৃতির সূচনা ঊনবিংশ শতকে দেখা দিয়েছিল, তাকে কোনক্রমেই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাববিপ্লব বলে গ্রহণ করা চলে না।

বাংলা এবং ভারতের নবজাগৃতি সম্পর্কে আলোচনার মোটামুটি পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি, বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যার প্রবক্তা, মূলত ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ও মানসমুক্তির জয়গানে মুখর। এটাকে আমরা আবেগপ্রধান পদ্ধতি বলতে পারি। এ পদ্ধতিতে সাধারণত আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয় বেশি। দ্বিতীয় পদ্ধতি, যা অধুনা অধিকাংশ পুস্তকে অবলম্বিত, ইংরেজ আগমনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাঙালির ব্যাপক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কয়েক দশকের মধ্যেই আমরা কেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছিলাম তার বিশদ ব্যাখ্যা। এ পদ্ধতিটিকে যুক্তিপ্রধান বা সামাজিক ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। তবে এ দুটো সিদ্ধান্তের মধ্যেই একটি মিল আছে, সেটি হল এই যে বাংলার নবজাগৃতি ইউরোপিয় রেনেসাঁসের কনিষ্ঠতম ফসল এবং ইংরেজের সঙ্গে মানস মিলনের ফলে এ ফসল অর্জিত হয়েছে।

অবশ্য এ দুটো পদ্ধতির মাধ্যমেই কিছুটা সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তবে সবটা নয়। ইউরোপিয় রেনেসাঁসের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি) নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। বিশেষত কার্ল মার্কসের বিখ্যাত structure-super structure theory যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো নিম্নতম বনিয়াদ এবং শিল্প সাহিত্য, ধ্যান ধারণা উপরিতলের ব্যাপার—নবজাগৃতির প্রাণধর্ম বিশ্লেষণে সুধীজন স্বীকৃত এই তত্ত্বটিকে অস্বীকার করা কঠিন। আগেই বলা হয়েছে, ইউরোপিয় রেনেসাঁসের মূল কথাই হল সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব। সমাজে নতুনতর শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। পুরোনো শ্রেণীবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে এই নতুন বিন্যাস সহজে হয়নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপিয় রেনেসাঁসের ইতিহাস এই ত্রিবিধ আন্দোলনের কাহিনীতে পূর্ণ এবং ইউরোপিয় শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতিতে এই আন্দোলনের ব্যক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইংরেজ ভারতে এসে এ দেশের মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটিকেই গ্রহণ করেছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে। ফলে, সামন্ততন্ত্র যেহেতু স্বার্থের দিক দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল তাই ইংরেজের সামান্যতম বিপদে এঁরা অস্থির হয়েছেন এবং এ দেশে ইংরেজের রাজ্যরক্ষা ও বিস্তারে সাহায্য করবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যতই প্রচার করুন না কেন, ইংরেজদের এ দেশে রাজ্যবিস্তারের প্রধানতম কারণই ছিল ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন। ব্যবসায়ী ইংরেজের কাছে ভারত ছিল কাঁচামালের জোগানদার ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। পরাধীনতার দরুন কম দরে কাঁচামাল বিজয়ী ইংরেজের কাছে ভারতীয়রা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকত, আবার পণ্যদ্রব্য ইংলন্ড থেকে এলে তা বেশি দরে তাকে কিনতে হত। ফলে উভয়ক্ষেত্রেই তাকে ঠকতে হত। ব্যবসায়ী ইংরেজ নিজের স্বার্থেই ভারতীয়দের ব্যবসা করার বিষয়টি সুনজরে দেখত না এবং কলকারখানা যাতে ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ইংরেজ কর্তৃক বাঙালি বস্ত্রশিল্পের নিধন কাহিনী তো ঐতিহাসিক কিম্বদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এই প্রচেষ্টার ফলে বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চসম্প্রদায়কে অনেক সময় বুর্জোয়া বলে উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু 'বুর্জোয়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মনে রাখলে তাকে ঐ অভিধায় অভিহিত করা চলে না। ইংরেজি শিক্ষায় বাঙালি ছিলেন মূলত চাকুরিজীবী ও জমির উপসত্বভোগী। শাসক ইংরেজ ও এঁদের শ্রেণীস্বার্থ ছিল প্রায় এক। ইংরেজ আগমন এঁদের কাছে তাই আশীর্বাদের মতো। বাংলার নবজাগৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন এঁরাই। তাই ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণে এঁদের মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের গতিরেখাটি অনুধাবন করতে পারি, কেননা নাটকের মধ্যেই জাতির মানসিকতা সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপিয় রেনেসাঁস এনেছিল জ্ঞানে ও কর্মে মুক্তি—যার উভয়মুখী সংমিশ্রণে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানে হয়েছিল বিরাট অগ্রগতি। নবজাগৃতির যুগে বাঙালির কর্মে অধিকার ছিল না। আগেই বলেছি, তাঁরা ছিলেন মূলত চাকুরিজীবী ও জমির উপসত্বভোগী। তাই কর্মে মুক্তি বাঙালির আসেনি। ফলে জ্ঞানের মুক্তি সর্বাঙ্গীন হতে পারেনি। ইউরোপিয় রেনেসাঁস যুগের বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাদের ছিল গুণগত পার্থক্য। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ভৌগোলিক নব নব আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি প্রভৃতি নানা বিষয় মানুষের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তাকে বৃহৎ বিশ্বের মুখোমুখি এনে হাজির করেছিল। তার ফলে, যে বিপুল কর্মোদ্দীপনা ইউরোপিয় রেনেসাঁসের মানুষ প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করেছিল, তার সার্থকতম প্রতিফলন ঘটেছে এলিজাবেথিয় নাট্যসাহিত্যে। ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ—এই মূলসূত্র তাই এলিজাবেথিয় নাট্যসাহিত্যই সর্বাপেক্ষা বেশি করে প্রমাণ করেছে। রেনেসাঁসের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি নবজাগৃতি যুগের বাঙালির পক্ষে করায়ত্ব করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বাঙালির বিজ্ঞান সাধনা ছিল কুণ্ঠিত। কর্মে অধিকার না থাকায় আবিষ্কারের নব নব পদ্ধতি নিয়ে মস্তিষ্ক বিকাশের প্রয়োজনও তার ঘটেনি। বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত উদ্ভাবন যা হয়েছে, তাকে অকিঞ্চিৎকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় সম্পদ বিকাশের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালায় তাই বাঙালির শ্রম নিয়োজিত হতে পারেনি। ফলে তাদের জীবনপ্রবাহ হয়েছে নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ। যথার্থ প্রগতির জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ আন্দোলন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। এই ত্রিবিধ আন্দোলনের মেলবন্ধনে রচিত হয় বিপ্লব। ইউরোপিয় রেনেসাঁস এই বিপ্লবের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেননি, দেশের গণজাগরণ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী। কদাচিৎ কোনো ক্ষেত্রে—যেমন নীল বিদ্রোহের সময়—তাঁরা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন বটে, তবু তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকাংশই ছিল কিছু মানবিক অধিকার লাভের দাবিদাওয়া—যেমন ইংরেজের সমতুল্য রাজপদ বা বিচারবিভাগীয় সমতা, এবং সেটুকু দাবি মেনে নেওয়াও ইংরেজের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ফলে নবজাগৃতি যুগের বাঙালির চিন্তা ও উদ্যমের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়েছে সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। সে শিক্ষার স্বরূপও মূলত শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে প্রযুক্ত শিক্ষা এবং দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই তা ছিল অনধিগম্য। অর্থাৎ বাংলার নবজাগৃতি যুগের বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীবিন্যাস যা ছিল তাতে সমাজসংস্কার ও ধর্মান্দোলনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্ভব ছিল না। বাঙালি রচিত নাট্য সাহিত্য এই মানস প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে।

তবে কি নবজাগৃতি একেবারেই অর্থহীন ও অফলপ্রসূ? উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ ধরনের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। বাংলার নবজাগৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থই প্রচুর পরিবর্তন এনেছিল, এ প্রসঙ্গে এ তথ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। মানবতাবোধ, স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী জাতির সামাজিক বন্ধন মোচন প্রচেষ্টা, প্রাচীন প্রথানুগত্য অপেক্ষা উদার ধর্মবোধের শ্রেষ্ঠতা প্রচার প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি রচিত সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্য এই বিশেষত্বগুলির স্বাক্ষরবাহী।

দুই

এবার নবজাগৃতি যুগের বিশেষত্বগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সে জন্য নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পর্ববিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত—এই একশো কুড়ি বছরের গতিরেখাটি এখানে অনুসরণ করা যেতে পারে। স্বভাবতই এই দীর্ঘ সময়ের গতিরেখাটি খুব সরল ও বৈচিত্র্যহীন হতে পারে না। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' রচনার মাধ্যমে মৌলিক নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত। তারপর রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধুর হাতে নাটকের যৌবনপ্রাপ্তি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার মধ্য দিয়ে পেশাদার রঙ্গ মঞ্চ যুগের শুরু এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত—অর্থাৎ বাংলা নাট্যসাহিত্য যাঁদের রচনায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হয়েছে—তাঁদের সাহিত্য কৃতি। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানে ১৯১২/১৩ সাল নাগাদ এ পর্বের সমাপ্তি ধরা যেতে পারে। ১৯১২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে গতানুগতিকতার যুগ। এ পর্বে কিছু ভালো রচনার সাক্ষাৎ পেলেও একালের নাট্যকারেরা গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের গৌরবজনক ব্যতিক্রম। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলি যাকে সমালোচকবৃন্দ সাঙ্কেতিক নাটক নামে অভিহিত করে থাকেন—তা এই পর্বেই রচিত। তাঁর 'শারদোৎসবে'র রচনাকাল ১৯০৮ এবং 'কালের যাত্রা' ও 'তাসের দেশ' যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এ সময়সীমার মধ্যে রচিত হয়েছে 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি কালজয়ী নাটক। রবীন্দ্রনাথের এই সুমহান নাট্যসাহিত্য যদি রচিত না হত তবে আলোচ্য পর্বটিকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুর্বল পর্ব বলা চলত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কখনও বাংলার সমকালীন নাট্যান্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চ—যার আশ্রয়ে গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল—অধিকাংশ সময়েই রবীন্দ্রনাথকে নানা যৌক্তিক ও অযৌক্তিক কারণে অবহেলা করে গেছে। এ বিষয়ে পরে আরও বিশদ আলোচনা করা যাবে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান। তার পরবর্তী পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে বাংলাদেশে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল, যার প্রভাব বাংলা সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্যে হল সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও নৌবিদ্রোহ, ছেচল্লিশের আত্মধ্বংসকারী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ ইত্যাদি নানা ঘটনাপ্রবাহ বাঙালির প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। তার ফলে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠল তার রচনারীতি ও বক্তব্য বিষয়েও গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৯৪২ সাল থেকেই, বলা যেতে পারে, এ পর্বের শুরু এবং তার রেশ অধুনাতনকাল পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য একেবারে হাল আমলে বাংলা নাটকের গতি পরিবর্তনের কিছু কিছু ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, তবে তা কতখানি অন্ত্যর্থক ও ফলপ্রসূ তা এ মুহূর্তে বিচার করা কঠিন। কাজেই এ সুদীর্ঘ একশো কুড়ি বছরের নাট্যসাহিত্যের যদি পর্ববিভাগ করা যায়, তা নিম্নরূপ হবে।

এক : ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মৌলিক নাট্যরচনার সূচনা কাল থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন পর্যন্ত। এ পর্বকে প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে।

দুই : ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন থেকে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত। এই পর্বকে প্রতিষ্ঠা পর্ব নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তিন : ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের তিরোধান থেকে আগস্ট বিপ্লব ও পঞ্চাশের মন্বন্তর পর্যন্ত। এ পর্বকে অনুকারী পর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

চার : ১৯৪৩ থেকে অধুনাতন কাল পর্যন্ত।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য যে উপরোক্ত পর্ববিভাগ কখনই যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে না। তাছাড়া পর্বগুলির সময়সীমায় মধ্যে আবার কখনও কখনও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব নাট্যসাহিত্যে হয়েছে গভীর ও ব্যাপক। এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

এক : ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ—হিন্দু মেলা

দুই : ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ—নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন

তিন : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

তিন

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটক যখন রচিত হতে শুরু করেছিল তখন নবজাগৃতির তরুণ কাল। ইংরেজের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির সম্পর্ক তখন অতি মসৃণ। তাছাড়া প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান—যার প্রভাবে বাঙালির মানসমুক্তি ঘটেছিল বলা হয়ে থাকে—তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কার প্রয়াস (যার অধিকাংশই ছিল স্ত্রীজাতির বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টা), রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের ধর্মান্দোলন, শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর ভূদেবের নিরলস শ্রম, এবং অন্যদিকে ইয়ং বেঙ্গলের বাঁধন-ছেঁড়া জয়োল্লাস—এই উভয় কোটির কর্মোদ্যমের প্রধান কথাই ছিল উদার মানবতাবাদের উদ্বোধন ও প্রাচীন প্রথার অন্ধ আনুগত্যকে অস্বীকার। কাজেই প্রথম সার্থক নাট্যকার রামনারায়ণের নাট্য প্রচেষ্টা যে সমকালীন সমাজ আন্দোলনের স্বাক্ষরবাহী হবে তা আকস্মিক নয়। প্রথম প্রবীণ প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকার মধুসূদনের নাট্যকৃতিতে যে অন্ধ প্রথানুগত্যের প্রতি ব্যঙ্গ ও উদার মানবতাবোধ ধ্বনিত হয়েছে তা গভীর অর্থবহ। যুগপরিবেশ ও প্রতিভার সার্থক মেলবন্ধন হয়েছিল মধুসূদনে। তাই তাঁর নাট্য রচনায় যে বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বাঙালির মানস ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার পরবর্তী নাট্যকারগণ তার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণে বাঙালির মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছিল এবং নাট্যসাহিত্য এই আকর্ষণ-বিকর্ষণে তরঙ্গায়িত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক।